

# Gender Portrait in literature and Culture

-Jubayer Ibn Kamal

## সাহিত্যকর্মে নারীর উপস্থিতি

বিশ্ব সাহিত্যের পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যকর্মে নারীর উপস্থিতি চোখে পরার মত। যদিও বা পুরুষের তুলনায় খানিকটা পিছিয়ে। এর জন্য রয়েছে সামাজিক ও বিভিন্ন দিকের চাপ। আমাদের আশেপাশে প্রচলিত স্টেরিওটাইপের বাইরেও সামাজিক বিভিন্ন বাধা তো রয়েছেই। দেখা যেত, বই ইন্ডাস্ট্রির প্রকাশকরা বিভিন্ন কারণে নারী লেখকদের বই প্রকাশ করতে চাইতেন না। তাদের ধারণা ছিলো নারীদের বই খুব বেশি জনপ্রিয় হবে না। এবং ব্যবসায়িক ভাবেও তারা ওতটা লাভবান হবেন না। তাছাড়া সৃজনশীল কর্মে নারীরা কতটুকু ভালো করতে পারবে এরকম হাস্যকর ধারণাও বহুদিন প্রচলন থাকতে দেখা গেছে। এটির প্রভাব ছিলো উভমুখী। শুধুমাত্র একজন সৃজনশীল নারী লেখকের আশেপাশের মানুষের এই ধারণা ছিলো সেরকমটা নয়; বরং নারী লেখকদের নিজেদের মধ্যেও মনস্তাত্ত্বিকভাবে এক ধরনের ভ্রান্ত ধারণা চলে আসতো যে, তারা হয়তো পুরুষ লেখকদের দৌড়ে সেভাবে সৃজনশীল লেখায় হয়তো তারা অক্ষম। এ কারণে আশির দশকের শেষ দিক থেকে বাংলা সাহিত্য তুলনামূলক ভাবে নারী লেখকদের উপস্থিতি কম দেখা যায়।

তবে যারা বাংলা সাহিত্যে নারী লেখক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন তারা পুরো বাংলা সাহিত্যের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আজকে আলোচনা করবো এরকম বেশ কয়েকজন নারী চরিত্র নিয়ে, যারা শুধুমাত্র নারী হিসেবে লেখকই নয়; বরং অধিকার নিয়ে ছিলেন সোচ্চার।

## জাহানারা ইমাম

জাহানারা ইমাম ছিলেন একজন বাংলাদেশী লেখিকা, কথাসাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ এবং একাত্তরের ঘাতক দালাল বিরোধী আন্দোলনের নেত্রী। তিনি বাংলাদেশে শহীদ জননী হিসেবে পরিচিত। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ একাত্তরের দিনগুলি। একাত্তরে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শাফী ইমাম রুমী দেশের মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন এবং কয়েকটি সফল গেরিলা অপারেশনের পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন এবং পরবর্তীতে নির্যাতনের ফলে মৃত্যুবরণ করেন। বিজয় লাভের পর রুমীর বন্ধুরা রুমীর মা জাহানারা ইমামকে সকল মুক্তিযোদ্ধার মা হিসেবে বরণ করে নেন। রুমীর শহীদ হওয়ার সূত্রেই তিনি শহীদ জননীর মযাদার্য ভূষিত হন।

ষাট ও সত্তর দশকে সাহিত্যজগতে জাহানারা ইমাম অল্প-বিস্তর পরিচিত ছিলেন শিশুকিশোর উপযোগী রচনার জন্য। কিন্তু তাঁর সর্বাধিক খ্যাতির কারণ দিনপঞ্জিরূপে লেখা তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ একাত্তরের দিনগুলি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি পুত্র রুমী ও স্বামীকে হারান। মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ নয় মাস কেটেছে তাঁর একদিকে উদ্বেগ, উৎকর্ষা ও ত্রাসের মধ্য দিয়ে; অন্যদিকে মনের মধ্যে ছিল দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার স্বপ্ন। সেই দুঃসহ দিনগুলিতে প্রাত্যহিক ঘটনা এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করার বৃত্তান্ত লিখেছিলেন তিনি নানা চিরকুটে, ছিন্ন পাতায়, গোপন ভঙ্গি ও সংকেতে। ১৯৮৬ সালে গ্রন্থরূপ পাওয়ার পর তা জনমনে বিপুল সাড়া জাগায়। বস্তুত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি শিহরণমূলক ও মর্মস্পর্শী ঘটনাবৃত্তান্ত হলো একাত্তরের দিনগুলি।



স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে জাহানারা ইমাম লেখালেখিতে ব্যস্ত সময় কাটান এবং তাঁর প্রধান গ্রন্থগুলি এ সময়ে প্রকাশ পায়। গল্প, উপন্যাস ও দিনপঞ্জি জাতীয় রচনা মিলিয়ে তাঁর আরও কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: অন্য জীবন (১৯৮৫), বীরশ্রেষ্ঠ (১৯৮৫), জীবন মৃত্যু (১৯৮৮), চিরায়ত সাহিত্য (১৯৮৯), বুকের ভিতরে আগুন (১৯৯০), নাটকের অবসান (১৯৯০), দুই মেরু (১৯৯০), নিঃসঙ্গ পাইন (১৯৯০), নয় এ মধুর খেলা (১৯৯০), ক্যানসারের সঙ্গে বসবাস (১৯৯১) ও প্রবাসের দিনলিপি (১৯৯২)।

## বেগম রোকেয়া

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (সাধারণত বেগম রোকেয়া নামে অধিক পরিচিত) হলেন একজন বাঙালি চিন্তাবিদ, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, সাহিত্যিক ও সমাজ সংস্কারক। তিনি বাঙালি মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত এবং প্রথম বাঙালি নারীবাদী। ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে বিবিসি বাংলার 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি' জরিপে ষষ্ঠ নির্বাচিত হয়েছিলেন বেগম রোকেয়া। ছোটগল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, বিজ্ঞান কল্পকাহিনী ও শ্লেষাত্মক রচনায় রোকেয়ার স্টাইল ছিল স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। উদ্ভাবনা, যুক্তিবাদিতা এবং কৌতুকপ্রিয়তা তার রচনার সহজাত বৈশিষ্ট্য। তার প্রবন্ধের বিষয় ছিল ব্যাপক ও বিস্তৃত। বিজ্ঞান সম্পর্কেও তার অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন রচনায়। মতিচূর (১৯০৪) প্রবন্ধগ্রন্থে রোকেয়া নারী-পুরুষের সমকক্ষতার যুক্তি দিয়ে নারীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জন করে সম-অধিকার প্রতিষ্ঠায় আহ্বান জানিয়েছেন এবং শিক্ষার অভাবকে নারীপশ্চাৎপদতার কারণ বলেছেন। তার সুলতানার স্বপ্ন (১৯০৫) নারীবাদী ইউটোপিয়ান সাহিত্যের ক্লাসিক নিদর্শন বলে বিবেচিত। পদ্মরাগ (১৯২৪) তার রচিত উপন্যাস। অবরোধ-বাসিনীতে (১৯৩১) তিনি অবরোধপ্রথাকে বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করেছেন।



রোকেয়ার কর্ম ও আদর্শ উদযাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার প্রতি বছর ৯ই ডিসেম্বর রোকেয়া দিবস উদযাপন করে এবং বিশিষ্ট নারীদের অনন্য অর্জনের জন্য বেগম রোকেয়া পদক প্রদান করে।

## তসলিমা নাসরিন

আশির দশকে একজন উদীয়মান কবি হিসেবে সাহিত্যজগতে তসলিমা নাসরিনের পদচারণা। নারীবাদী ও ধর্মীয় সমালোচনামূলক রচনার কারণে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন। তিনি তার রচনা ও ভাষণের মাধ্যমে লিঙ্গসমতা, মুক্তচিন্তা, নাস্তিক্যবাদ এবং ধর্মবিরোধী মতবাদ প্রচার করায় ইসলামপন্থীদের রোষানলে পড়েন ও তাদের নিকট হতে হত্যার হুমকি পাওয়া শুরু করেন। ১৯৯৪ সালে তিনি বাংলাদেশ ত্যাগ করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাস করতে বাধ্য হন।



## হুমায়ূন আহমেদের নারী চরিত্র নির্মাণ

নারীর সাজের ক্ষেত্রে তিনি কখনই আধিক্য দেখাননি। বরং বলা যেতে পারে, কৃপণতা দেখিয়েছেন। তাই কোনো কোনো গল্পে নায়িকাকে দেখা যায় লিপস্টিক দিয়েও আবার মুছে ফেলতে। নিজেকে

নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত থাকার এই যে স্বভাব, হুমায়ূন আহমেদ তা স্পষ্ট করেই লিখে গেছেন। রূপা উপন্যাসে লিখেছেন- এখানকার রূপা জোসনা রাতে নীল শাড়ি পরে হিমুর জন্য অপেক্ষা করে না।

এ রূপাও রূপবতী এবং বুদ্ধিমতী। এ রূপাও রূপবতী অর্থাৎ হুমায়ূন আহমেদের অমর সৃষ্টি হিমুর নায়িকা রূপাকেও তিনি রূপবতী হিসেবে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। প্রায় উপন্যাসে নায়িকাদের তিনি রূপের বর্ণনা করতে গিয়ে সুন্দরীর উপমা না দিয়ে বরং মায়াবতী ও রূপবতী বলে আখ্যায়িত করেছেন। শুধু তাই নয় বিদেশি নারীর ক্ষেত্রেও তিনি রূপবতী উপমা টেনেছেন।

আমি এবং কয়েকটি প্রজাপতি উপন্যাসে লিখেছেন- রোমেলকে দেখলেই আমার কেন জানি তলিয়ে যাওয়া সাবমেরিনের কথা মনে হয়। সে পড়াশোনা রাশিয়ায় করেছে। রূপবতী এক রাশিয়ান মেয়েকে বিয়ে করেছে।

গল্পের নায়িকা কিংবা নারী চরিত্র সব ক্ষেত্রেই নায়িকার সাজ ছিমছাম। তিনি নারীকে বরাবরই মায়াবতী ও রূপবতী বলে আখ্যায়িত করেছেন। হুমায়ূনের গল্পের নায়িকারা অনেকটা পাহাড়ি ঝর্ণার মতো। ছন্দময়, গতিশীল; কিন্তু কোনো বাড়াবাড়ি নেই। পাটভাঙা নীল শাড়ি, চোখে হালকা কাজল, কপালে নীল টিপ আর হাতে ক'গাছা চুড়ি- বেশিরভাগ গল্পে এমন সাজেই সাজতে দেখা গেছে নায়িকা চরিত্রকে। খুব ধনী পরিবারের হলে দামি কোনো পাথরের গয়না গলায় কিংবা কানে পরতে দেখা গেছে কখনও কখনও।

একটাল রেশম কালো চুল লক্ষ করা গেছে বেশিরভাগ নায়িকা চরিত্রের ক্ষেত্রে। গ্রামের মেয়ে হলে নাকে নোলক, চোখে গাঢ় কাজল আর দু'পাশে দুই বেণি। শহরের হলে বড়জোর ছেড়ে রাখা চুলে কানের গোড়ায় গুঁজে নেয়া তাজা কোনো ফুল। তবে শাড়িই ছিল নায়িকার প্রধান পোশাক। এর বাইরে সালোয়ার-কামিজ কিংবা ওয়েস্টার্ন পোশাক যে পরতে দেখা যায় না, তা নয়।

'শ্রাবণ মেঘের দিন'র কুসুম চরিত্রটি বেশ জনপ্রিয়। সহজ-সরল গ্রামের মেয়েটি সাজতে ভালোবাসে। সাজ বলতে সেই চোখে কাজল, দুই বেণি, আর কোটা শাড়ি। মূলত নায়িকা চরিত্রগুলোর সরলতাই তাদের অনন্য করে তুলেছে।

‘আগুনের পরশমণি’র রাত্রি চরিত্রের কথা মনে আছে নিশ্চয়ই? মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ঘটনা নিয়ে লেখা উপন্যাসটি প্রচুর পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। এখানে ঘরবন্দি থেকেও কীভাবে স্বাধীন আকাশের স্বপ্ন দেখা যায়, তা নায়িকা চরিত্রের চোখে ঐকে দিয়েছেন লেখক।

‘আমার আছে জল’র দিলশাদ কিংবা দিলু শেষটায় এসে কাঁদিয়েছে সবাইকে। ভালোবাসার জন্য নিজের জীবনকে বিসর্জন দেয়া এক অদ্ভুত নারী চরিত্র। নারী না বলে ঠিক কিশোরী থেকে যুবতীর মাঝামাঝি কোনো একটা বয়স বললে বেশি মানানসই হবে। তুমুল প্রেম আর অভিমান ভরা হৃদয় নিয়ে চুপিচুপি হারিয়ে যাওয়া দিলুকে এখনও মনে রেখেছে মানুষ।

## উপসংহার

সমাজ-সংসারের কারণেই নারী গণ্ডিবদ্ধ। একজন নারী সাহিত্যিককে তাঁর লেখার মান নিয়ে সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌঁছাতে যত কাঠখড় পোড়াতে হয়, পুরুষ সাহিত্যিককে ততটা নয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কল্যাণে শিল্পাঙ্গনের অনেক ঘটনা-অঘটনার বিশ্লেষণ চলতে থাকে পরবর্তী মুখরোচক সংবাদের আগমনের আগ পর্যন্ত। ঘটনা এ রকম, একবার এক নারী সাহিত্যিক পুরুষ সাহিত্যিকদের আয়োজিত আড্ডায় রাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এটাকে তথাকথিত উদারপন্থীরা স্বাগত জানালেও যাঁরা নীচতার মনোজগৎ থেকে বেরোতে পারেননি, তাঁরা সেই নারীকে ঘিরে মনগড়া অশালীন কাহিনির অবতারণা করলেন। নারী নাক-কান মলে প্রতিজ্ঞা করলেন আর ভুলেও কোনো দিন ও রকম আড্ডায় পা রাখবেন না।

সাহসী নারী শিল্পী-সাহিত্যিকেরা কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে তাঁদের কাজের ক্ষেত্রে গণ্ডি ভাঙছেন। তাঁদের সৃষ্টি আমাদের বিস্মিত করছে। কারণ, শিল্প-সাহিত্যের জগতে নারীর অবাধ পদচারণের বয়স পুরুষের হাঁটুর বয়সী। গণমাধ্যমে তাঁদের কথোপকথন বুদ্ধিদীপ্ত, পরিপক্ব ও পরিশীলিত। সেখানে দীর্ঘদিনের অনুশীলিত অনেক পুরুষ সাহিত্যিককেও প্রাজ্ঞতায় খানিক খর্ব বোধ হয়। অবশ্য অনেকের অনুকূল পরিবেশ ও অনুপ্রেরণাদায়ী সঙ্গীর অবস্থান চলার পথকে আরও মসৃণ করে। উত্তম মানুষে (ব্যাকরণের ‘উত্তম পুরুষ’ লিঙ্গনিরপেক্ষ হওয়া বাঞ্ছনীয়) রচিত নারীর সাহিত্য একই আঙ্গিকে রচিত পুরুষের সাহিত্যের মতো করে বিবেচনা করতে হবে। এ ধরনের আঙ্গিককে সাহিত্যিকদের আত্মজীবনী ভেবে ব্যক্তিগত আক্রমণ সুপাঠকসুলভ আচরণ নয়। এ আঙ্গিকের নারী সাহিত্যিককে আরও বেশি সমালোচনায় বিদ্ধ হতে হয়। কিন্তু আশার কথা, কোনো খিস্তিখেউড় গায়ে

না মেখে এসব পথিকৃৎ অকুতোভয় নারী অনুসরণীয় হয়ে উঠছেন ওই সব নারীর জন্য, যাঁরা ‘পাছে লোকে কিছু বলে’—এর দলে ছিলেন। বাইরে বেরোলে প্রকৃতি, মানুষ ও সতীর্থের সাহচর্যে ভাবনার জগৎ, অভিজ্ঞতার ভান্ডার সমৃদ্ধ হয়—এ তো সত্যি। কিন্তু ভয়াত শৈশব, অব্যক্ত কৈশোর, বৈষম্যের যৌবন, অতৃপ্তির দাম্পত্য, সামাজিক নিষ্পেষণ যে বিষয়বৈচিত্র্য হাজির করে তা কেন সাহসের অভাবে নারী সাহিত্যিককে গণ্ডিবন্ধের অপবাদে কলঙ্কিত করবে?

সমাপ্ত